মুসলিম মাইন্ডসেট

ইতিবাচক মানসিকতা অর্জনের কার্যকরী কৌশল

মূল

জাকিয়া খলিল

অনুবাদ

আয়াতুল্লাহ্‌ নেওয়াজ

সন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপাতা

অনুবাদকের কথা ৯

ভূমিকা ১২

মুসলিম মাইন্ডসেট কী? ২০

অধ্যায় এক

ঈমান পরিচর্যা ২৫

- জ্ঞান অর্জন ২৮
- ফরয ইবাদাত ২৯
- পর্দা করা ৩১
- দাড়ি রাখা ৩৩
- কুরআনের সাথে বন্ধুত্ব ৩৩
- মৃত্যুর কথা স্মরণ করা ৩৫
- আল্লাহর সাথে একান্তে সময় কাটানো ৩৭

অধ্যায় দুই

বাবা-মার প্রতি বিনয় ৪১

- যেভাবে বিনয়ী হওয়া যায় ৪২
- বাবা-মার ভুল উপেক্ষা করা ৪৪

অধ্যায় তিন

সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস ৪৭

- ভালো বন্ধু কারা? ৪৭
- জবাবদিহিতা আছে এমন সাহচর্যে থাকা ৫২
- বিষাক্ত মানুষ থেকে দূরে থাকা ৫৩
- তর্কপ্রিয় মানুষ এড়িয়ে চলা ৫৪

অধ্যায় চার

ক্ষমার শক্তি ৫৫
- কেন ক্ষমা করা উচিত? ৫৬
- নিজেকে ক্ষমা করা ৫৮
- অন্যের কাছে ক্ষমা চাওয়া ৫৯
- 'যদি এমন করতাম!' ৬২
- তাকদীরে সন্তুষ্টি ৬৪

অধ্যায় পাঁচ

সুস্থ দেহে সুন্দর মন ৬৬
- সঠিক খাওয়া-দাওয়া ৬৭
- প্রতিদিন ব্যায়াম ৬৮
- মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ ৭০

অধ্যায় ছয়

আশাবাদী মনোভাব ৭৫
- সকাল গুছিয়ে নেওয়া ৭৬
- নিরাশার জগতে আর নয় ৭৬
- নিজের ব্যাপারে সুধারণা ৭৭
- সবকিছুই কি সম্ভব? ৭৯
- চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা ৮১
- বর্তমানে বসবাস ৮১

অধ্যায় সাত

ভোরের পাখি ৮৭
- ভোরে জাগার কিছু কৌশল ৮৮

অধ্যায় আট

কৃতজ্ঞ হৃদয়, প্রশান্ত মন ৯৪
- কৃতজ্ঞতা চর্চা করবেন যেভাবে ৯৫

আপনি কোন কোন কারণে কৃতজ্ঞ? ৯৭
হাদীস থেকে শিক্ষা ৯৮

অধ্যায় নয়

ধৈর্যের মহিমা ১০১
ধৈর্যের রকমফের ১০১
ধৈর্যের উপকারিতা ১০৪

অধ্যায় দশ

লক্ষ্য পূরণের পথে ১০৮
একটি মজার কাজ ১০৯
আগ্রহের কাজ যেভাবে খুঁজে পাবেন ১১১
মেন্টরের সাহায্য ১১৩
অনুপ্রেরণা পাবার উপায় ১১৬
সালাতুল ইসতিখারা ১২৪

শেষ কথা ১২৭

মুসলিম মাইন্ডসেট কী?

যেকোনো ইতিবাচক পরিবর্তনের শুরুটা হয় আমাদের মন থেকে। জীবনের উন্নতি ও পরিবর্তনের জন্য আমাদের মনকে প্রথমে বদলাতে হবে। প্রিয় ভাই আমার, আমাদের জীবনে যা প্রয়োজন তা অর্জনের যথেষ্ট ক্ষমতা আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। এ বিশ্বাসটাই হলো এক ধরনের মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গি। যখন এ বিশ্বাস আমাদের মনে ও আচরণে গেঁথে যাবে, তখনই তা আমাদের মানসিকতা হয়ে গড়ে উঠবে।

এ মানসিকতা অর্জনের মূল চাবিকাঠি হলো আশাবাদী হওয়া। মনোবিজ্ঞানী ড. ক্যারল ডুয়েকের মতে, ইতিবাচক মানসিকতা গড়ার জন্য অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নিজেদের পরিবর্তন ও উন্নতি করার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। আমরা চাইলে জীবনের যেকোনো পর্যায়ে পড়াশুনা ও চর্চা করে নিজেদের বদলে ফেলতে পারি। আমরা যদি আজ সংগ্রাম করে আমাদের মানসিকতা সামান্য পরিমাণও উন্নত করতে পারি, তবে আরও উৎসাহ পাব। ফলে ক্রমাগত অনুশীলন ও নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে আরও উন্নতি করতে পারব। এক্ষেত্রে নিজেদের স্মার্টনেসের ওপর ভরসা না করে বরং প্রতিদিন চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ওপর আমাদের জোর দিতে হবে।

অন্যদিকে, নেতিবাচক মানসিকতা ঠিক এর বিপরীত। ড. ডুয়েক একে 'স্থির মানসিকতা' বলেছেন। এ ধরনের মানসিকতার কারণে মানুষ বিশ্বাস করে, তাদের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা অপরিবর্তনীয়; নিজেকে আরও উন্নত করা অসম্ভব। ব্যর্থতা ও নিজেকে বোকা দেখাবে এ ভয়ে অনেক মানুষই নতুন কিছুর জন্য চেষ্টা করে না। নিজের চিন্তাভাবনা ও দক্ষতা উন্নত করার চেষ্টা করে না।

আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবিদের (রদিয়াল্লাহু আনহুম) জীবনী পড়তে গিয়ে দেখি, তারা ইসলামের নতুন জীবনযাত্রা মেনে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ভয় পাননি। তারা যদি লোকভয় করতেন, তবে ইসলাম খুব বেশিদূর এগোত না। লোকেরা তাদের ক্ষ্যাত বলেছে, পাগল বলে উপহাস করেছে, তবু তারা ইসলামের জন্য ঝুঁকি নিতে কার্পণ্য করেননি।

নিরাশ মানুষ শুধু সমস্যাই আগে দেখতে পায়। সে প্রায় সব পরিস্থিতিতে মন্দ পরিণতির আশা করে। নেতিবাচক মানসিকতার ফলে মানুষ অল্পতেই হতাশ হয়ে পড়ে। অন্যদের সহজে বিশ্বাস করতে পারে না। চ্যালেঞ্জের মুখে তারা খুব একটা চেষ্টা না করেই হাল ছেড়ে দেয়। নিরাশ মানসিকতার লোকেরা প্রায়শই মানসিক চাপে থাকে। দুশ্চিন্তা আর দুঃখভারাক্রান্ত মনে দিন কাটায়। তারা সাধারণত একা থাকে, আর ভয়ানক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে। তাদের কাছে পৃথিবী যেন এক বিষণ্ন-বিরক্তিকর জায়গা।

তারা খুব দ্রুত অকৃতজ্ঞ ও অধৈর্য হয়ে যায়। একটুতেই অভিযোগ করে। নিজ প্রতিভা ও আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামাতগুলোকে খাটো করে দেখে। তারা ভয় করে তাদের সাথেই সবচেয়ে খারাপ ঘটবে এবং ঘটেও তাই। ফলে নিজের ওপর নিরাশা আরও পাকাপোক্তভাবে জেঁকে বসে। এ ধরনের নিরাশ মানসিকতা থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে এবং ইতিবাচক তথা মুসলিম মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য কাজ করতে হবে।

ইতিবাচক মানসিকতা অর্জন কঠিন কিছু নয়। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও উম্মাহর পূর্ববর্তী প্রজন্মের সেরা মানুষেরা সবসময় আশাবাদী থাকতেন। একজন মুসলিমের মন-মানসিকতার ভিত্তিই হলো আশা ও সুধারণা। সে প্রতিটি পরিস্থিতিতে উত্তম সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। সবসময় আল্লাহর ওপর কৃতজ্ঞ থাকে। কঠিন সময়ে ধৈর্যশীল থাকে, আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখে। মুসলিম মানসিকতা তো এটাই।

এ ধরনের মানসিকতা একদিকে যেমন নেতিবাচক চিন্তা ও হতাশাকে ছুড়ে ফেলে দেয়, অন্যদিকে তেমনি জীবন ও মননের উন্নতির পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়। জীবন যে পরিস্থিতিতে যেমনই থাকুক না কেন, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাকদীরের নির্ধারণে মুসলিম সন্তুষ্ট থাকে। একইসাথে সে এটাও মাথায় রাখে যে, তার পরিস্থিতির পরিবর্তন ও অর্থবহ জীবন গড়ে তোলার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত স্বাধীন

ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন, যা দ্বারা সে বেছে নিতে পারে জীবনটা সে কীভাবে গড়ে তুলতে চায়। আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা থাকলে কোনো নেতিবাচক চিন্তা মুসলিমের সামনে দাঁড়াতে পারে না। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, আশার আলোর দেখা সে পায়ই।

বক্সার মুহাম্মাদ আলির কথাই ধরুন। তিনি ছিলেন আশাবাদী মানসিকতার এক চমৎকার উদাহরণ। তার ব্যাপারে ড. ডুয়েক বলেন, 'বক্সিং বিশেষজ্ঞরা বক্সারদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাদের সামর্থ্য মাপেন। এর মধ্যে ছিল বক্সারের মুষ্টির সামর্থ্য ও নাগাল, বুকের দৈর্ঘ্য এবং দেহের ওজন। মুহাম্মাদ আলির এর কোনোটাই ঠিকভাবে ছিল না। তার প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতা ছিল, কিন্তু একজন আদর্শ বক্সারের মতো না ছিল তার শরীর, না ছিল তার শক্তি। এমনকি প্রথাগত অনেক কৌশলেও তিনি ছিলেন দুর্বল। সত্যি বলতে, তার বক্সিং-এর পুরোটাই ছিল খুঁতে ভরা।' এরপর ডুয়েক বলেন, 'কিন্তু ক্ষিপ্রতার পাশাপাশি তার আরেকটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল- তার মানসিকতা।'

এক বিখ্যাত বক্সিং ম্যানেজার মুহাম্মদ আলি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তিনি ছিলেন প্যারাডক্স। রিং-এ তার পারফরম্যান্স ছিল ভুলে ভরা। ...কিন্তু তার মস্তিষ্ক ছিল নিখুঁত। তিনি আমাদের সবাইকে দেখিয়েছেন সমস্ত বিজয় এখান থেকে আসে।' বলে তার তর্জনী দিয়ে তার মাথার দিকে ইশারা করলেন। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে আশাবাদী মানসিকতার সেরা উদাহরণগুলোর একজন মুহাম্মাদ আলি।

একজন মুসলিমের মানসিকতা সবসময় হওয়া উচিত আশাবাদী। সে জীবনের সমস্ত বাধা ও চ্যালেঞ্জের সামনে আশার আলো দেখতে পায়, যেমনটা দেখতেন প্রথাগত বক্সারের কোনো গুণ না থাকা মুহাম্মাদ আলি। নিজের বিশ্বাস, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সম্পর্কের ব্যাপারে মুসলিম সবসময় আশাবাদী থাকে। ইসলামের চোখে সে জীবনকে দেখে। মুসলিম মানসিকতার কারণে আমরা নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের সেরা মানুষদের অনুসরণ করার চেষ্টা করি। তাঁদের মতো করে আমরা আমাদের জীবন সাজানোর চেষ্টা করি, আল্লাহর ইবাদাত করি, মানসিক শান্তি ও জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করি, সুস্বাস্থ্য ও সুসম্পর্ক ধরে রাখি এবং আশাবাদী জীবন কাটাই। মুসলিম মানসিকতার মাধ্যমে আমরা চারপাশ থেকে উত্তম বিষয়গুলো ছেঁকে আলাদা করি। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো উত্তমরূপে মোকাবিলা করি।

মুসলিম মানসিকতা আমাদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। ডুয়েক একে তুলনা করেছেন 'মানসিক শক্তি'র সাথে। এ হলো কষ্ট সহ্য করে স্রোতের বিপরীতে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি। প্রত্যেকেই প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যায়। কোনো ধর্ম, সংস্কৃতি, মানুষ বা জাতিসত্তা কষ্ট থেকে মুক্ত নয়। আমরা প্রত্যেকেই জীবনে কখনো-না-কখনো কষ্টকর দিন কাটিয়েছি। এমন চরম সংকটপূর্ণ সময় ও কষ্টের মুখোমুখি হয়েছি, যখন আবেগের হাল ধরে রাখা খুব কঠিন ছিল। হতাশার সাগরে নিকষ কালো ঢেউয়ে ডুবে যাওয়াটাই ছিল তখন নিতান্ত স্বাভাবিক।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কীভাবে আমরা এ কষ্টগুলো মোকাবিলা করি। মূলত আমাদের মানসিকতার আদলেই আমরা এসময়গুলোতে প্রতিক্রিয়া দেখাই। আমাদের মানসিকতা অনুযায়ী আমরা জীবনের সব সমস্যা, অসুবিধা ও কষ্টের মোকাবিলা করি। তাই আপনার সকল সমস্যার সমাধান আপনার মাঝেই আছে। আর তা এক কথায় হলো, আপনার মানসিকতার পরিবর্তন।

মুসলিম মানসিকতার শক্তিবলে একজন মুমিন সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, ধৈর্য ধরে থাকতে পারে। সে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ সবসময় তার পাশে আছে। আমাদের মানসিকতা আমাদের ইহ-পরকালের সব সাফল্যের চাবিকাঠি। মুসলিম হিসেবে আমাদের ছোট থেকেই শেখানো হয়, সবসময় আল্লাহর কাছে ভালো আশা করতে। এ ব্যাপারে একটি হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন,

> 'আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জনসমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।'[৩]

আল্লাহ সম্পর্কে এ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম মানসিকতারই অংশ।

[৩] বুখারি, ৭৪০৫, সহীহ।

আমরা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যত সুধারণা রাখব, জীবনে তত বেশি সফল হতে পারব। এটাই সফলতার রহস্য। এটাই আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক নিয়ম। আল্লাহর কাছে আমরা সবসময় মঙ্গল কামনা করব। আমাদের মনেপ্রাণে এ বিশ্বাস করতে হবে যে, আমাদের প্রয়োজনে আল্লাহ আমাদের দিকে ছুটে আসেন। আমরা কখনোই একা নই। আল্লাহ সবসময় আমাদের দেখছেন, আমাদের যত্নের সাথে লালন করছেন।

প্রিয় সাহাবি ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, 'তাঁর শপথ, যিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই! মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে যেমন ভাবে, তিনি তাকে তেমনই দান করেন। তাঁর হাতে যা আছে সবটাই ভালো।'[৪]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ ব্যাপারে আমাদের জিজ্ঞেস করেছেন,

فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَٰلَمِينَ

'জগতসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী?'[৫]

এরকম আরও অসংখ্য আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা মুসলিম মানসিকতার প্রয়োজন এবং আল্লাহর প্রতি সুধারণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পাই। বিশ্বজগতের সমস্ত নিয়ামাত আল্লাহর হাতে। ইসলামসম্মত জীবন ও মানসিকতা গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা এসব নিয়ামাত অর্জন করতে পারি।

বইয়ের বাকি অংশ জুড়ে আমরা কীভাবে মুসলিম মানসিকতা অর্জন করতে পারি তার গাইডলাইন তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ। মুসলিম মানসিকতা অর্জনের বহু উপায় ও পন্থা রয়েছে। মুসলিম মানসিকতা অর্জনে আমার কাছে সবচেয়ে উপকারী মনে হয়েছে এমন বিষয়গুলো দশটি অধ্যায়ে সাজিয়ে আমি এ বইয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মুসলিম মাইন্ডসেট গড়ে তোলায় কাজে আসবে এমন বিভিন্ন কার্যকরী কৌশল প্রতিটি অধ্যায়ে তুলে ধরেছি। আপনি যদি এ বই থেকে অন্য কিছু নাও নিতে পারেন, তবে শুধু এ একটি কথা নিন—

'আপনি আল্লাহকে যেমনটা মনে করবেন, তিনি আপনার প্রতি তেমনই আচরণ করবেন। তাঁর দিকে হেঁটে যান, তিনি আপনার দিকে দৌড়ে আসবেন।'

[৪] ইবনু আবিদ দুনিয়া, আল্লাহর প্রতি সুধারণা, ওয়াফি পাবলিকেশন।

[৫] সূরা সাফফাত ৩৭ : ৮৭।

অধ্যায় এক

ঈমান পরিচর্যা

মুসলিম মানসিকতা অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহর ওপর ঈমান আনা। সত্যি বলতে, ঈমান আনার অর্থ হলো পুরো জীবন বদলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া। মুসলিমের ইহ ও পরকালীন উভয় জীবনের সাফল্য নির্ভর করে ঈমানের ওপর। এ দু জগতেই আমাদের অবস্থার ওপর ঈমানের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে।

আমরা যদি আমাদের নিজেদের, পরিবারের ও সমাজের কল্যাণ চাই, তবে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি ও এর পরিচর্যা করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন ধরনের আমল, যেমন, জ্ঞান অর্জন, ফরয ইবাদাত পালন, কুরআন তিলাওয়াত, মৃত্যুর কথা স্মরণ, আল্লাহর যিকর, ইত্যাদি অভ্যাস হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ঈমান তো হওয়া উচিত এমন যে, আমরা আল্লাহর জন্য প্রতি মুহূর্ত টান অনুভব করব এবং তাঁর সাথে দূরত্ব বাড়লে শূন্যতা অনুভব করব। ঈমানের এ স্তর অর্জন করতে পারলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে আশার আলোয় আলোকিত হবে।

ঈমান কী? আলিমদের মতে, ঈমান হলো অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করা, মুখে এর সাক্ষ্য দেওয়া এবং দেহের অঙ্গের মাধ্যমে কাজে বাস্তবায়ন করা।[৬] ঈমানের এ তিনটি দিক নিয়ে এখন আলোচনা করব যেন এর মাধ্যমে আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করতে পারি।

ঈমান হলো আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেওয়া। এটা বিশ্বাস করা যে, কোনো ধরনের শরিক ছাড়াই তিনি একমাত্র স্রষ্টা। তিনি সবসময় আমাদের দেখছেন, পথ দেখাচ্ছেন এবং রিযক দিচ্ছেন। তিনি জীবন দান করেন এবং

[৬] ড. বুগা আল-মুস্তাফা, আল-ওয়াফা (বৈরুত, দারু ইবনি কাসীর, ২০০৩) পৃ. ১৫।

ফিরিয়ে নেন। আল্লাহর দিকে আমাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন।

ঈমানের অংশ হলো আল্লাহর অদৃশ্য সৃষ্টি, যেমন, ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। এটা সাক্ষ্য দেওয়া যে, তারা আল্লাহর সম্ভ্রান্ত বান্দা যারা কখনো তাঁর অবাধ্য হয় না। তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে। তারা কখনো পানাহার করে না, তাদের মাঝে ছেলে-মেয়ের কোনো ভেদাভেদ নেই। তারা কাউকে সন্তান হিসেবে জন্ম দেন না, কারও থেকে জন্ম নেন না। তাদের সংখ্যা কেবল আল্লাহই জানেন।[৭]

ঈমানের আরেকটি অংশ হলো, আল্লাহ যেসব আসমানি কিতাব ও সহিফা পাঠিয়েছেন সেসবে বিশ্বাস করা। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আল্লাহ পাঠিয়েছেন ছোট ছোট সহিফা, দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাবূর, মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে তাওরাত, ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে ইনজিল এবং আমাদের নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে কুরআন। আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ নবি ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন। ঈমানের অংশ হলো শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করা, যেদিন আমরা পুনরুজ্জীবিত হব এবং আমাদের আমলের হিসাব নেওয়া হবে।

ঈমানের সর্বশেষ অংশ হলো, আল্লাহ আমাদের যে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা এবং তাকদীরে বিশ্বাস করা যা আমাদের জন্য আগে থেকেই নির্ধারিত রয়েছে; যেমন, কে আমাদের বাবা-মা হবে, আমাদের রিযক কী হবে ইত্যাদি।

এ সবগুলো বিশ্বাস আমাদের অন্তর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কাজ দিয়ে প্রকাশ করাই হলো ঈমান।

আসলে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করা মুসলিম মাইন্ডসেট অর্জনে খুব শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কেউ হয়তো প্রচণ্ড কষ্টে কাতর, কিন্তু শক্তিশালী ঈমানের কারণে এ কষ্ট তার মনে খুব কমই প্রভাব ফেলে। আমরা যখন বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ সত্যিই আছেন, তখন চরম বিপদের মাঝে তাঁর ওপর সবটুকু ভরসা রাখতে পারি। এভাবে আমরা চরম দুশ্চিন্তা ও হতাশার অনল থেকে সহজেই বেঁচে যাই। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ যেমন আমাদের পরীক্ষা নেন, তেমনি তিনি সকল কষ্ট দূর করেন। তাই তাঁর

[৭] আল-ওয়াফা, পৃ. ১৫।

সাহায্য আসার আগ পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

এক্ষেত্রে একটা বিষয় বলে রাখা ভালো—আল্লাহর ওপর আস্থা রাখার অর্থ এই নয় যে, পার্থিব দুঃখ-কষ্ট মুসলিমকে প্রভাবিত করবে না। মানুষমাত্রই দুঃখ-কষ্ট-হতাশা অনুভব করে। একজন মুসলিম এর ঊর্ধ্বে নয়। অন্তরে হতাশা কাজ করলে কেউ দুর্বল মুসলিম হয়ে যায় না। নবি-রাসূল, তাঁদের সাহাবি এবং পূণ্যবান সালাফদের জীবনে দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা আমরা পড়েছি। পার্থিব কষ্টে জর্জরিত হয়ে তাঁরা আল্লাহর কাছে মুক্তির ফরিয়াদ জানাতেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাদের ঈমান কম ছিল। কুরআনে আমরা আইয়ুব (আলাইহিস সালাম)-এর জীবনী থেকে দেখেছি যে, আঠারো বছর তিনি চরম দুঃখ-কষ্ট ও অসুখের মাঝে কাটিয়েছেন। তবু শত কষ্টের মাঝে তিনি আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থেকেছেন। দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তি জীবনের অংশ। যখন আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনি ও তাওয়াক্কুল করি, তখন এ কষ্টগুলো আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

এ দুনিয়ার বুকে আমাদের বেঁচে থাকতে হলে আল্লাহকে চিনতে হবে ও তাঁর সম্পর্কে জানতে হবে। ঈমানদার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও জীবনের মিশন হলো আল্লাহকে জানা ও তাঁর ইবাদাত করা। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটা কিন্তু একটি শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গিও বটে। নিজের মাঝে এমন মানসিকতা গড়ে তুলতে পারলে এমন আত্মবিশ্বাসী ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করা সম্ভব যে, মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও তা খুব সামান্যই আমাদের বিচলিত করবে। এমনটা তখনই হবে যখন আমরা আল্লাহর অস্তিত্বে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করব এবং মনে গেঁথে নেব যে, আল্লাহ সবসময় আমাদের পাশেই আছেন। আমাদের কোনো ক্ষতি তিনি হতে দেবেন না।

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস আমাদের জন্য সবকিছু সহজ করে দেয়। কোনো বাধাকে বাধা মনে হবে না যখন আমরা বিশ্বাস করব, আল্লাহ আমাদের পাশে আছেন। তিনি তো চিরঞ্জীব, পরাক্রমশালী। স্থান-কাল-সবকিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান। যখন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের সবকিছু হয়ে যায়, তখন বাকি বিষয়গুলো আমাদের জন্য গৌণ হয়ে যায়। এমনকি আমরা নিজেরাও এখানে এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নই, যদিও আল্লাহ মানব জাতিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

তাহলে কীভাবে আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে, আমরা আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি এবং তিনি আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু?

এখন আমাদের ঈমান বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে এমন কিছু বিষয় আলোচনা করব। এগুলো কাজে লাগাতে পারলে কোনো কিছুতে আমরা খুব বেশি দুশ্চিন্তিত হব না এবং আশার সাথে ইতিবাচকভাবে জীবন কাটাতে পারব ইনশাআল্লাহ।

জ্ঞান অর্জন

আমাদের ঈমান শক্তিশালী করার প্রথম ধাপ হলো আল্লাহর সত্তা এবং তিনি আমাদের কাছে কী চান সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানা। আমরা অনেকেই তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি ও তাঁর ইবাদাত করি, অথচ তাঁর সম্পর্কে খুব কমই জানি। তাই আল্লাহর সম্পর্কে জানুন। এটা আপনাকে আল্লাহর আরও কাছে নিয়ে যাবে এবং ঈমানকে শক্তিশালী করবে। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

‘প্রতিটি মুসলিমের ওপর জ্ঞানার্জন ফরয।’[৮]

আবদুর রহমান ইবনু ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘প্রতিটি মুসলিমের এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক, যা তাকে ফরয ইবাদাত করার সামর্থ্য যোগাবে।’

জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও হাদীস রয়েছে। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

‘আল্লাহ যার জন্য কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন।’[৯]

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি, মানুষ জ্ঞানার্জন করলে আল্লাহ তাকে এ পথে সাহায্য করবেন। জ্ঞানার্জনকে তার জন্য সহজ করে দেন এবং ইসলামের বুঝ দান করেন। এভাবে সে আল্লাহর মনোনীত বান্দার কাতারে শামিল হয়ে যায়।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব যেন তিনি আমাদের দ্বীনের জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার তাওফীক দেন। আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাস হওয়া উচিত আল্লাহর কাছে জ্ঞান ও হিদায়াতের জন্য দুআ করা। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের দুআ কবুল করবেন এবং কল্পনাতীত উপায়ে আমাদের সাহায্য করবেন। তবে এক্ষেত্রে আমরা কোথায় এবং কার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন

[৮] সুনানু ইবনি মাজাহ, ২২৪, সহীহ।
[৯] বুখারি, ৭১, সহীহ।

করছি তা গুরুত্বপূর্ণ।

এজন্য আপনার আশেপাশে বিশ্বস্ত আলিম খুঁজে বের করুন। তার কাছে জ্ঞানার্জন করুন। আপনার স্থানীয় মাসজিদের দারসে নিয়মিত অংশ নিন। আপনার কাছাকাছি মাসজিদ না থাকলে বা সেরকম যোগ্য আলিম না থাকলে নির্ভরযোগ্য আলিমের কাছে সশরীরে গিয়ে বা অনলাইনে ইসলামি পড়াশোনার চেষ্টা করুন। আমরা পরিবারের সবাই মিলে একজন আলিমকে মোবাইলে কল দিয়ে স্পিকারে তার দারস শুনতাম। ধীরে ধীরে আমরা আমাদের কমিউনিটির মহিলাদের এ দারসে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিলাম এবং তারাও তার দারস শুনতে শুরু করল।

এছাড়া অনলাইনে এখন বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে যেখানে মুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে শেখানো হয়। শাইখ ফারাজ রব্বানীর তত্ত্বাবধানে এরকম একটি ওয়েবসাইট আছে।[১০] আপনার বিশ্বস্ত পরিচিত আলিমদের কাছে এরকম আরও ওয়েবসাইটের তথ্য পাবেন, যা ইসলামি জ্ঞান অর্জনে আপনাকে সাহায্য করবে।

এক্ষেত্রে খুব সাবধান থাকতে হবে, আমরা যেন এ ব্যাপারে নিজের জন্য অজুহাত বের না করি। আল্লাহর কাছে সাহায্য চান এবং আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। দেখবেন, আল্লাহ আপনার জন্য জ্ঞানার্জনের দরজা খুলে দেবেন। তখন আপনি তাঁর সম্পর্কে, তাঁর দ্বীন সম্পর্কে আরও জানতে পারেন। ইনশাআল্লাহ, জ্ঞান অর্জনের পথে একবার নেমে গেলে আপনার তৃষ্ণা বাড়তেই থাকবে। তখন আরও বেশি ইসলাম সম্পর্কে আপনার জানতে ইচ্ছে করবে।

ফরয ইবাদাত

আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী ফরয ও ওয়াজিব ইবাদাতগুলো পালন করুন। মুসলিম হিসেবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পুরোপুরি মেনে না চললে নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে পারবেন না। ইতিবাচক মানসিকতা অর্জনও কঠিন হয়ে যাবে।

প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মাঝে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার ইচ্ছা কাজ করে। কিন্তু তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়া সম্ভব হবে না যদি তাঁর আদেশ অমান্য

[১০] https://seekersguidance.org/

করি। এজন্য আমাদের প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময়মতো যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। আমাদের নিজেদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন আমরা পূর্ণ মনোযোগ ও ইখলাসের সাথে সালাত আদায় করতে পারি।

স্বীকার করছি, এটা বলা যতটা সহজ, করা ততটাই কঠিন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আল্লাহ চান আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু করি। বাকিটা তিনি আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দেবেন।

আমার আরবি শিক্ষক একজনের গল্প বলেছিলেন। তিনি টানা বিশ বছর সালাত আদায় করলেন, তবু আল্লাহ তাআলার জন্য অন্তরে তেমন কোনো টান আসছিল না বা অন্তরের কোনো পরিবর্তন মনে হচ্ছিল না। তারপরও তিনি সময়মতো সালাত আদায় করে যেতে থাকলেন। বিশ বছর পর তিনি সেই কাঙ্ক্ষিত মিষ্টতা পেতে শুরু করলেন। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয়টি হলো, আমাদের মনমতো হোক বা না হোক আল্লাহর আদেশ পালন করতেই হবে। সালাতে একাগ্রতা অর্জনে আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যান। একসময় দেখবেন আল্লাহ আপনার জন্য এটি সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু এর শুরুটা আমাদের তরফ থেকে হতে হবে।

আল্লাহ কখনোই আমাদের সালাত ও জীবন রাতারাতি বদলে দেবেন না। হ্যাঁ, তিনি এমনটা করার ক্ষমতা রাখেন। তবে তিনি আমাদের চেষ্টাটুকু দেখতে চান। জীবনের সবকিছুই ধীরে ধীরে অর্জন হয়। এ জীবন হলো এক দীর্ঘ পথচলা। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন আমরা প্রতিদিন আল্লাহর আদেশগুলো ইখলাসের সাথে মেনে চলি। এভাবে একসময় সেই বিশ বছর ধরে সালাত আদায়কারীর মতো আমরাও সালাতের মধুরতার স্বাদ পাব এবং প্রতিটি ইবাদাতে প্রশান্তি অনুভব করব ইনশাআল্লাহ।

মনে রাখবেন, সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকলে দিনের বাকি সময়গুলোও ভালো কাটবে। সালাত আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। মন হালকা করবে। এ অনুভূতি আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার এবং সঠিকভাবে আদায় করা সালাতের প্রত্যক্ষ ফলাফল। এটা কুরআন তিলাওয়াতের সুফলও বটে।

আমি বিশ্বাস করি, সালাত মানুষ হিসেবে আমাদেরকে পরিপূর্ণ করে এবং আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের গভীরতা বাড়ায়। সালাত আমাদেরকে পাপ ও নির্লজ্জতা থেকে দূরে রাখে, ঈমানকে মজবুত করে, আত্মিক ও মানসিক উন্নতিতে ভূমিকা রাখে। তাই যখনই আপনি কোনো বিপদে পড়বেন

তখনি আপনার সালাতকে যাচাই করুন কতটুকু সঠিক হচ্ছে। আরও উন্নত করার চেষ্টা করুন।

হাদীসে এসেছে, যখনই নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো বিপদে পড়তেন, সালাতের দিকে ছুটে যেতেন। সালাতের মাঝেই আছে সমাধান। সালাত আসমান-জমিনের স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের সোজা রাস্তা খুলে দেয়।

অন্যান্য ফরয ইবাদাতগুলো পালন করুন। আপনার ওপর যাকাত ফরয হলে আদায় করুন। রমাদানে সাওম রাখুন। সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ ও উমরা আদায় করুন। আল্লাহর একত্ব ও নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার পর এ কাজগুলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়।

পর্দা করা

বোনদের জন্য একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পর্দা করা। নিজের দেহ ও মাথা আবৃত রাখা। চুল ও চেহারা গাইর মাহরামকে দেখানো মেয়েদের জন্য পাপ। পাপ মানুষের জীবনকে বারাকাহহীন ও নিয়ামাতশূন্য করে ফেলে। আমরা সমাজের মানুষকে খুশি করতে কত শ্রম ও সময় ব্যয় করি, কিন্তু এগুলো আমাদের ওপর ফরয নয়। এর থেকেও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের ফরয ইবাদাতগুলোর প্রতি। এরপর অতিরিক্ত হিসেবে যেকোনো ভালো কাজই আমরা করতে পারি।

অনেক মুসলিম বোন নিজেকে পুরোপুরি প্র্যাক্টিসিং মনে করেন না। তাই হিজাবের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবেন না ভেবে হিজাব করেন না। এটা ঠিক যে, ফিতরাতের বশে মানুষ নিজের প্রকৃত অবস্থা অন্যদের সামনে তুলে ধরতে চায়। অনেকে ভাবে, অন্তর ও আমলের দিক দিয়ে তারা ভালো মুসলিম নয়। তাই হিজাব পরা দ্বিমুখিতা। এমন দ্বিমুখিতা থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু এটা হিজাব না করার দলিল হতে পারে না। এটা হিজাব সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা। আল্লাহ আমাদেরকে কখনো বলেননি যে, বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলিম হিসেবে দেখানোর জন্য আমাদেরকে অন্তর থেকেও পরিপূর্ণ ও নিখুঁত মুসলিম হওয়া লাগবে।

আল্লাহ জানেন মানুষ নিখুঁত নয়, পাপ করে। তারপরও তিনি আদেশ

অধ্যায় দুই

বাবা-মার প্রতি বিনয়

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমার বাবা-মার দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত। আমি দুনিয়াকে যেভাবে দেখি সেই দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটাই তাদের থেকে পাওয়া। আমার মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলায় তাদের অনেক অবদান আছে। বাবার কাছে আমি শিখেছি সবসময় কীভাবে আশাবাদী হয়ে বাঁচতে হয়, এমনকি যেখানে কোনো পথ নেই সেখানেও। তাদের কাছে শিখেছি জীবন নিয়ে অভিযোগ করতে নেই। আসলে জীবনের কষ্টগুলোর তুলনায় এত বেশি নিয়ামাত আমরা পেয়েছি যে, কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট থাকার জন্য সেগুলোই যথেষ্ট। যেকোনো পরিস্থিতিতে দয়ালু ও বিনয়ী হওয়ার শিক্ষাটা আমি তাদের কাছেই পেয়েছি।

বাবা-মা আমাদের শিক্ষক। তারা আমাদের এমন কিছু শিখায়, যা আমরা স্কুলে শিখি না। আমরা যেভাবে দুনিয়াকে দেখি, এর অনেকটাই আমরা শিখি তাদের কাছে। বাবা-মা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের পথ চলায় বেশ ভালোভাবেই অবদান রাখেন। এ কারণেই আমি একটি পুরো অধ্যায় বাবা-মাকে নিয়ে লিখেছি। এ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি কীভাবে তাদের প্রতি আমাদের বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দেওয়া যায় এবং মুসলিম মাইন্ডসেট গড়ে তোলায় কীভাবে তাদের সাহায্য পাওয়া যায়। বাবা-মার সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো ও সুন্দর হলে আমাদের মাঝে সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলা সহজ হবে, যা আমাদের জীবনকে বদলে দিতে পারে।

পৃথিবীতে আপনাকে আপনার বাবা-মার চেয়ে বেশি কেউ ভালোবাসবে না। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। একমাত্র বাবা-মা আমাদের জন্য আন্তরিকভাবে কল্যাণ কামনা করেন। তারা কোনো প্রতিদান আশা করেন না। অধিকাংশ বাবা-মাই আসলে এমন। আপনার আজকের দিনটি খারাপ

কাটলে বা এখন আপনি অনিশ্চয়তায় হাবডুবু খেলে বাবা-মার কোলে আশ্রয় নিন। তাদেরকে আপনার সমস্যার কথা খুলে বলুন। আপনার জন্য বেশি বেশি দুআ করতে বলুন। বাবা-মার দুআ আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেন না।

আমি জানি, কারও কারও হয়তো তার বাবা-মার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক নেই। বাবা-মার সাথে আলোচনা করা তাদের জন্য বেশ কঠিন। এজন্যই বাবা-মার সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আপনার বাবা-মা আপনার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। তাদের প্রজ্ঞা আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের পথচলায় সাহায্য করবে। তাদের প্রজ্ঞা কেবল আপনাকেই উপকৃত করবে না, বরং আপনার সন্তান, নাতি-নাতনি এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও প্রভাবিত করবে। আপনার পরবর্তী প্রজন্ম আপনার বাবা-মার সাথে আপনার ভালো সম্পর্কের সুফল ভোগ করবে ইনশাআল্লাহ।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, 'বাবা-মার সাথে কীভাবে এরকম চমৎকার সম্পর্ক আমরা গড়ে তুলতে পারি?' আসলে অনেকেই চায়, বাবা-মার সাথে সম্পর্ক ভালো করতে, কিন্তু ভেবে পায় না কোথা থেকে শুরু করবে। বাবা-মার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হলো, তাদের সামনে বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দেওয়া। বিনয়ী হলে আল্লাহ মানুষের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। এটা তাঁর ওয়াদা।

বাবা-মা, ভাই-বোন ও সমাজের মানুষের সাথে মুহাব্বত ও ভালোবাসা বাড়ানোর একটি কার্যকরী উপায় হলো বিনয়। এটা তাদের অন্তরে আপনার জন্য গভীর ভালোবাসা তৈরি করবে। দূরে ঠেলে দেওয়ার বদলে তারা আপনাকে বুকে টেনে নেবে, সম্মান করবে। আপনার সম্পর্কে সুধারণা রাখবে।

যেভাবে বিনয়ী হওয়া যায়

বিনয়ী হবার উপায়গুলো বেশ সহজ। এগুলো কাজে লাগাতে পারলে আমাদের জীবনে এর অসাধারণ প্রভাব পড়বে ইনশাআল্লাহ। বিনয়ী হওয়ার সময় মনে রাখতে হবে যে, আমাদের ওপর বাবা-মার অধিকারগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে। তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে এবং সেগুলো যেকোনো অবস্থায় পালন করা জন্য আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন।

পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, বাবা-মায়ের প্রতি আচরণে সুন্দর

ও দয়াশীল হওয়াকে আল্লাহ আমাদের জন্য ওয়াজিব করেছেন। কুরআনে বহুবার আল্লাহর ইবাদাত করার পরপরই বাবা-মার প্রতি দায়িত্বশীল থাকার নির্দেশ এসেছে। কথায় ভদ্র ও বিনয়ী তো হতেই হবে, এমনকি বিরক্তি এলেও সামান্য 'উফ' শব্দটা তাদের বলা যাবে না। বিরক্তির ছিটেফোঁটাও যেন আমাদের চেহারায় না আসে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এভাবেই আদেশ দিয়ে বলেছেন,

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَ بِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ
عِنۡدَكَ الۡكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنۡهَرۡهُمَا
وَ قُلۡ لَّهُمَا قَوۡلًا كَرِیۡمًا وَ اخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحۡمَةِ وَ
قُلۡ رَّبِّ ارۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّیٰنِیۡ صَغِیۡرًا

'তোমার রব আদেশ দিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত না করতে ও বাবা-মার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে পৌঁছালে তাদেরকে 'উফ্' বোলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না; তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলো। মমতাবশে তাদের প্রতি বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দাও এবং বলো, 'হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।'[১৩]

উপরোক্ত আয়াতে যদিও বাবা-মার বৃদ্ধ বয়সের কথা বলা হয়েছে, তবে কথাগুলো তাদের যেকোনো বয়সের জন্যই প্রযোজ্য। এ আয়াত থেকে আমরা আরও শিখি যে, বাবা-মার জন্য আমাদের দুআ করতে হবে। আল্লাহ ও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে যে, যখন আমরা ছোট ও অসহায় ছিলাম, তখন তারা আমাদের যত্ন নিয়ে লালন করেছেন। কত অদ্ভুত দেখুন, বাবা-মা আমাদের শৈশবের অসহায় অবস্থায় সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছেন, অথচ আমাদের এর বেশিরভাগই মনে নেই।

আবূ হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'নাক ধূলিমলিন হোক, আবারও নাক ধূলিমলিন হোক, আবারও নাক ধূলিমলিন হোক।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'কোন ব্যক্তির, হে আল্লাহর রাসূল?' তিনি বললেন, 'যে তার বাবা-মার উভয়কে অথবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে

[১৩] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩-২৪।

পারল না।'[১৪]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে দেখা যায়, বাবা-মাকে অবহেলা করা বা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা কত ভয়ংকর! যারা বাবা-মার প্রতি দায়িত্বের ব্যাপারে উদাসীন ইসলামে তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। আল্লাহর অসন্তুষ্টি তাদের ঘিরে রাখে। তাই বাবা-মার প্রতি দয়া, ভালোবাসা, উদারতা ও সম্মান দেখাতে আমরা যেন কোনো ত্রুটি না রাখি। আমাদের কাছ থেকে তারা যেন কোনোভাবেই মনে আঘাত না পান।

অনেক সময় এমন হয় যে, বাবা-মার সাথে আমাদের মতের মিল হয় না। হয়তো পুরো পরিস্থিতি আমরা যেভাবে জানি তারা সেভাবে পুরোটা জানেন না। এক্ষেত্রে তাদের মতামতকে উড়িয়ে না দিয়ে বিনয়ের সাথে তাদের অবকাশ দেওয়া উচিত। একই সাথে আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, আমরা সবকিছু জানি না এবং তাদের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন। বিশেষ করে, খুব তরুণ বয়সে আমরা এমন সমস্যার মুখোমুখি হই যা আমাদের পক্ষে সামলানো মুশকিল। সেক্ষেত্রে বাবা-মার কাছে আমাদের সাহায্য চাইতে হবে। আর প্রয়োজনের সময় বাবা-মার কাছে সাহায্য চাইবেন না তো কার কাছে চাইবেন! দেখবেন, তারাও আগ্রহ ভরে আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

বাবা-মার ভুল উপেক্ষা করা

বিনয়ী হবার আরেকটি উপায় হলো, বাবা-মা কোনো ভুল করলে সেটা মেনে নেওয়া। তারাও তো মানুষ। আমাদের উচিত তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া, এমনকি তারা যদি আমাদের ব্যাপারে ভুল করে বসেন এবং এমন ভুল যাতে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ধরে রাখাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আমাদের উচিত সেসব ভুল ক্ষমা করে দেওয়া। ক্ষমা মানুষের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া তৈরি করে। এ সম্পর্কে আমরা সামনে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

বাবা-মার সামনে আমাদের এটা ভেবে আরও বিনয়ী হওয়া উচিত যে, তারা আমাদের চেয়েও অনেক বেশি বয়স জীবনে কাটিয়েছেন। তারা এমন সব কষ্ট সহ্য করেছেন যা আমাদের কল্পনারও বাইরে। তাই আমাদের উচিত

[১৪] মুসলিম, ২৫৫১, সহীহ।

তাদের সম্মান করা, ভালোবাসা ও মাথায় তুলে রাখা। মাথায় তুলে রাখতে বললাম, কারণ, প্রতিটি মানুষের জন্য মাথা হলো সম্মানের প্রতীক। বাবা-মার সামনে বিনয়ে নত হলে আমরা তাদেরকে সম্মানের সাথে উঁচুতে তুলে রাখতে পারব। এভাবে তাদের জন্য আমাদের বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দিতে পারি।

আমাদের কখনোই এমনটা ভাবা উচিত নয় যে, আমাদের পরিবারে বাবা-মা স্বৈরাচারী শাসকের মতো। তাদের সাথে আলোচনার কোনো পথ নেই। আপনার মনে হতে পারে, তারা আপনার সমস্যা বুঝবেন না। কারণ, আগেও একই সমস্যা তারা বোঝেননি। এটা ভুল ধারণা। বরং যেকোনো সমস্যায় পড়লে তাদের মতামত ও পরামর্শ শুনুন।

বাবা-মার বহু বছরের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা থাকে, যা দিয়ে তারা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে সাহায্য করতে পারেন। আপনি যখন বিপদে পড়বেন তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পর বাবা-মার কাছে যান। তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতার দরজা আমাদের জন্য সবসময় খোলা। তারা সবসময় আমাদের ভালো চান।

বাবা-মার সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের সব সময় শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী থাকতে হবে। তাদের সাথে আমরা যেন মুখে মুখে তর্ক না করি, কটু কথা না বলি। তাদের সিদ্ধান্তের পেছনে শক্তিশালী কারণ থাকতে পারে। এজন্য নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা হলো, মানুষের জন্য যতটা পারা যায় অজুহাত তৈরি করা, সম্ভব হলে সত্তরটা পর্যন্ত অজুহাত তৈরি করা। কারও জন্য পাঁচ-দশটা অজুহাত বানাতে যান, দেখবেন আপনি শান্ত হয়ে গিয়েছেন। আপনার মন্দ ধারণা ও রাগ চলে গিয়ে সেখানে জায়গা নিয়েছে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা।

বাবা-মার জন্য সত্তরটা অজুহাত খুঁজে বের করার পর উলটো আপনারই মনে হবে, আপনি ভুল করেছেন। তখন আল্লাহর কাছে কেঁদেকেটে ক্ষমা চান যে, তাদেরকে না বুঝেই আপনি খুব দ্রুত তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ভেবে দেখুন, আপনার বাবা-মা কতটা কঠিন সময় আগে পার করে এসেছে এবং এখনো প্রতিদিন কত কষ্টের মাঝে আছেন। এসব ভাবলে আমার মনে হয় না সত্তরটা অজুহাত কারও বের করার প্রয়োজন পড়বে। এরপরেও যদি আমরা তাদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা রাখি, তবে বুঝতে হবে দোষটা আসলে তাদের নয়, আমাদেরই।

আমরা যা ভাবি সেটাকেই চূড়ান্ত ভেবে বসা বোকামি। কেবল আমাদের বাবা-মাই নয়, বরং অধিকাংশ মানুষই ভালো। আল্লাহ আমাদের যেন তাওফীক দেন মানুষের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার, যা তাঁকে আরও খুশি করবে।

বাবা-মার সাথে আচরণে সহজ ও নম্র হোন। তাদের প্রতি কোমল হৃদয় ও দয়ালু হোন। খুব তাড়াতাড়ি তাদের ক্ষমা করে দিন। তাদের সাথে খারাপ অভিজ্ঞতাগুলো ভুলে যান। বরং ভালো অভিজ্ঞতাগুলোর দিকে মনোযোগ দিন। তারা আপনার জন্য যে আত্মত্যাগ করেছে সেগুলো নিয়ে ভাবুন। ইনশাআল্লাহ, এটা তাদের ব্যাপারে সুধারণা করতে সাহায্য করবে। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। কারণ, তিনি চান আপনি যেন বাবা-মা ও অন্যদের প্রতি দয়ালু হন। তিনি আপনাকে পুরস্কৃত ও ক্ষমা করতে ভালোবাসেন।

মুসলিম মানসিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাবা-মার প্রতি দয়ার বিশেষ গুরুত্ব আমরা শিখলাম। তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক যখন ভালো থাকবে, তখন আশাবাদী ও ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তোলা অনেক সহজ হয়ে যাবে। আমরা শিখলাম কীভাবে বাবা-মার সাথে দয়ালু আচরণ করতে হয় এবং তাদের প্রতি দায়িত্বশীল থাকার মাধ্যমে কীভাবে সম্পর্ক সুমধুর করা যায়। এ অধ্যায়ের শিক্ষাগুলো যদি আমরা জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মুসলিম মাইন্ডসেট খুব সহজে আমরা অর্জন করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

অধ্যায় তিন

সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস

মানুষ তার বন্ধুর মতো। এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করে। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্ব, শখ ও চরিত্র আলাদা। কিন্তু যাদের আমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি তাদের স্বভাব-চরিত্র আমাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অনেকখানি ধারণা দেয়।

নিজের বন্ধুদের দিকে তাকান। নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু আঁচ করতে পারবেন। মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এটা বেশ প্রজ্ঞার একটি বিষয়। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাই বলেছেন যে, মানুষ আখিরাতে তার সঙ্গেই থাকবে যাকে সে ভালোবাসে।[১৫] এ হাদীস আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত দু'জগতেই প্রযোজ্য।

আমাদের বন্ধুবান্ধব দেখে অনেকটাই বোঝা যায়, আমরা কেমন এবং সামনে কেমন হতে পারি। তাই আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে এবং আপনার লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করবে এমন মানুষের সঙ্গে সময় কাটানো আপনার জন্য বেশ গুরত্বপূর্ণ। এর উলটোটা হলে আপনার লক্ষ্য অর্জনের পথ ছেড়ে দূরে সরে যাবার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

ভালো বন্ধু কারা?

ভালো বন্ধু তারাই যারা আপনাকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেবে। তারা আপনাকে ভালো কাজে উৎসাহ দেবে এবং আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরে

[১৫] বুখারি, ৩৬৮৮, সহীহ।